বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতি

প্রেক্ষাপট, দারিদ্র দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন

১. ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতিঃ ধারনা ও বিবর্তন

২০১২ সালের জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক প্রথম সম্মেলনে UN Conference on Sustainable Development-UNCSD (held in Rio de Janeiro in 2012) সমুদ্র অর্থনীতি বা Blue Economy ধারনাটি নিয়ে বৈশ্বিক আলোচনা শুরু হয়। সেখানে বলা হয়, সাগর এবং সমুদ্রও হতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার। আলোচনায় আরও বলা হয়, বর্তমান উন্নয়ন কৌশল কোন অবস্থাতেই পরিবেশের সুরক্ষা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারছে না। সক্ষেত্রে সমুদ্রকে উন্নয়নের অংশ করা এবং সমুদ্রকেন্দ্রিক সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা টেকসই উন্নয়ন বিশেষ করে দরিদ্র দূরীকরন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, জীবনযাত্রার উন্নয়নসহ পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে গৃহীত কৌশলসমুহকে আরও গতিশীল করতে পারবে।

২. ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি

ব্লু-ইকোনমি মূলত সামুদ্রিক সম্পদ এবং সমুদ্রকে ব্যবহার করে গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে নির্দেশ করে। এ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে সর্বসম্মত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা প্রণয়ন এখনও সম্ভব হয়নাই তবে আলোচনা চলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ বিষয়ক একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সমুদ্র, সাগর এবং উপকূলই হচ্ছে ব্লু-ইকোনমির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু এবং এ কর্মকান্ড একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় কৌশলকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সহায়তা করতে পারে। সকল দেশই ব্লু-ইকোনমির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এমন কি সাগরকেন্দ্রিক নয় বা ভুমিবেষ্টিত এমন দেশসমুহও।

সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যেমন লক্ষ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও জীবজন্তু, যাদেরকে ঘিরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হতে পারে। এ ছাড়াও রয়েছে তেল ও গ্যাস, বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক খনিজ সম্পদ যা একটি দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। সারা বিশ্বের সামুদ্রিক এলাকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। সামুদ্রিক পর্যটন এখন সারা বিশ্বে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যা পরিবেশ সুরক্ষায় অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালনসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতেও পালন করতে পারে। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবহন, তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ, স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচলনা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। তাই ২১ শতকে সমুদ্র অর্থনীতি সকল দেশের কাছেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ন ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমুহ

অর্থনৈতিক খাতসমুহ	কর্মসুচি/কার্যক্রম
মৎস্য আহরণ	সামুদ্রিক মৎস আহরন ও মৎস্য চাষ, সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ।
জাহাজ চলাচল ও জাহাজ ব্যবস্থাপনা, বন্দর এবং সামুদ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহায়ক পরিসেবা	জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত, জাহাজের স্বত্বাধিকার এবং পরিচালনা, জাহাজ প্রতিনিধিত্ব এবং দালালি, জাহাজ ব্যবস্থাপনা, মাছ ধরার নৌকা এবং বন্দর প্রতিনিধিত্ব, বন্দর বাণিজ্য, জাহাজ সরবরাহ, কনটেইনার শিপিং পরিষেবা, খালাশি, রোল অন-রোল অফ অপারেটর, শুল্ক গ্রহন, মালবাহী জাহাজ ফরওয়ার্ডার, নিরাপত্তা এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
সামুদ্রিক জৈবপ্রযুক্তি	ঔষধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, সামুদ্রিক শৈবাল চাষাবাদ, শৈবালজাত খাদ্য প্রস্তুত, সামুদ্রিক জৈব পণ্য ।
খনিজ পদার্থ	তেল ও গ্যাস, গভীর সমুদ্রিক খনি (বিরল ধাতু, হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান)
সামুদ্রিক নবায়নযোগ্য শক্তি	বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন, সমুদ্রের ঢেউ হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, জোয়ারের ঢেউ হতে শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি।
সামুদ্রিক পণ্য	নৌকা মেরামত, জাহাজ মেরামত, জাল তৈরি, নৌকা এবং জাহাজ নির্মাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রের যোগান দান, জলসেচন প্রযুক্তি, সমুদ্র শাসন, সামুদ্রিক শিল্প প্রকৌশল।
সামুদ্রিক পর্যটন ও অবকাশ	সমুদ্রে মৎস্য শিকার, সমুদ্র তিরে মৎস্য শিকার, সমুদ্রে নৌকা পরিষেবা, সমুদ্রে নৌকাচালনা, ওয়াটার স্কিইং, জেট স্কিইং, সার্ফিং, সেইল বোর্ডিং, সি কায়াকিং, স্কুবা ডাইভিং, সমুদ্রের সাঁতার,উপকূলীয় এলাকায় পাখি, তিমি, ডলফিন প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবকাঠামো পরিদর্শন, সমুদ্র সৈকত ভ্রমন এবং দ্বীপ ভ্রমণ ইত্যাদি।
সামুদ্রিক স্থাপনা নির্মাণ	সামুদ্রিক স্থাপনা নির্মাণ এবং প্রকৌশল।
সামুদ্রিক বাণিজ্য	সামুদ্রিক আর্থিক সেবা, সামুদ্রিক আইনি সেবা, সামুদ্রিক বীমা, জাহাজ বিনিয়োগ ও এ সম্পর্কিত সেবা, চার্টারার, মিডিয়া ও প্রকাশনা।
সামুদ্রিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	সামুদ্রিক প্রকৌশল পরামর্শ দাতা, আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা, পরিবেশ সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা, জল-জরিপ পরামর্শ দাতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শ দাতা, আইসিটি সমাধান, ভৌগলিক -তথ্য সেবা, প্রমোদ তরি নকশা, সাবমেরিন টেলিকম।
শিক্ষা এবং গবেষণা	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি।

তথ্যসুত্রঃ Govt. of Ireland and Marine Institute (2012)

৩. বাংলাদেশে ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব

ক. অর্থনৈতি কর্মকান্ড পরিচলনার জন্য সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তি হওয়ায় মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। সাথে আছে ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণীজ-অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার। মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রে বিরোধপূর্ণ ১৭ টি ব্লকের ১২টি

পেয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের কাছ থেকে দাবিকৃত ১০টি ব্লকের সবগুলো পেয়েছে বাংলাদেশ। সাথে বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের ১৯ হাজার বর্গকিলোমিটার পেয়েছে বাংলাদেশ আর বাকি ৬ হাজার দেওয়া হয়েছে ভারতের অধিকারে। **দুই বছরের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত এ রায় দুটিকে প্রত্যেকেই বাংলাদেশের 'সমুদ্র বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। এ রায়ে বাংলাদেশের স্থলভাগের বাইরে জলসীমায়ও আরেক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটারের বাংলাদেশের জন্য ১ লক্ষ ১৯ হাজার বর্গ কিলোমিটারের সমুদ্রসীমা আরেকটা গোটা বাংলাদেশই বটে।** তবে সমুদ্র বিজয়ই চূড়ান্ত বিষয় নয়, বরং বলা চলে সম্ভাবনার সূচনামাত্র। এখন এই বিজয়কে প্রকৃতার্থে অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ন করতে হবে অর্থাৎ এর সম্পদ ব্যবহার করে আমাদের উন্নয়ন তরান্বত করতে পারি। করে তুলতে চাই বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমুদ্র সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সরকার একটি কৌশল হিসাবে গ্রহন করেছে

প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে যে তেল-গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে ভূতাত্ত্বিকরা বলছেন, বাংলাদেশ অংশেও তা পাবার প্রবল সম্ভাবনা আছে। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেন্ট ও পেট্রোবাংলার যৌথ জরিপে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে প্রচুর পরিমাণ তেল-গ্যাসের মজুদ রয়েছে মর্মে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। এই জরিপ মতে, অগভীর সমুদ্রে সাড়ে আট ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) গ্যাস রয়েছে।** তবে এ জরিপে গভীর সমুদ্রের তেল-গ্যাস সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ভারতীয় কোম্পানি ওএনজিসি এবং সিঙ্গাপুরভিত্তিক কোম্পানি কৃশকে একটি করে ব্লকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে কাজ করছে। বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার বাংলাদেশকে যেমন দিতে পারে আগামী দিনের জ্বালানি নিরাপত্তা, তেমনি বদলে দিতে পারে সামগ্রিক অর্থনীতির চেহারা। **বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাগরে প্রাণিজ-অপ্রাণিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, জিডিপিকে দুই অঙ্কের ঘরে নিতে পারে খুব সহজেই। এমনকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব।** সমুদ্র নির্ভর এই ব্লু-ইকোনোমির বদৌলতে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব।

৪. সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলি: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

ক. মৎস সম্পদ/ সামুদ্রিক খাবার: বিশ্বের ৪৩০ কোটি মানুষের ১৫% প্রোটিনের যোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (আইআইএসডি) প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছর প্রায় **২ কোটি ৩০ লাখ টন অনুমোদিত টেকসই সামুদ্রিক খাদ্য ১ হাজার ১৫০ কোটি ডলারে বিশ্বজুড়ে বিক্রি হয়, যা বৈশ্বিক উৎপাদনের ১৪%। বিশ্বের ১০-১২ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য সামুদ্রিক খাদ্য শিল্পের ওপর নির্ভরশীল।** বর্তমানে অনুমোদিত সামুদ্রিক খাদ্যের ৮০% প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা হয়। তবে সামুদ্রিক খাদ্য চাষের খামার দ্রুত বাড়ছে। জাপান, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে অনুমোদিত সামুদ্রিক খাদ্যের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। বিশ্বের সামুদ্রিক খাদ্যের ৬৯% এশিয়ায় উৎপাদিত হলেও অনুমোদিত সামুদ্রিক খাদ্যে এর অবদান মাত্র ১১%।

খ. খনিজ সম্পদ ও শক্তি সম্পদ: পৃথিবীর ৩০% গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে। ২০২০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ কপার, কোবাল্ট, জিঙ্ক রয়েছে তার ৫% ব্যবহার করা যাবে সমুদ্রের আকরিক থেকে, যার আর্থিক মূল্য ৫ বিলিয়ন ইউরো। ২০৩০ সালের মধ্যে এর পরিমাণ হবে দ্বিগুণ।

গ. সামুদ্রিক পরিবহন: বাণিজ্যিক পরিবহনের ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয় সমুদ্রপথে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় সবটুকুই সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল। সমুদ্রপথে বাণিজ্য সম্প্রসারণে বন্দরগুলোর গুরুত্ব বিশিষ্ট সমুদ্র গবেষক ইয়োহানেস গিলের গবেষণা থেকে জানা যায়। ইউরোপের উপকূলীয় দেশগুলো সমুদ্র অর্থনীতি থেকে প্রতি বছর ৫০০ বিলিয়ন ইউরো আয় করতে পারে, যা তাদের জিডিপির ১০ শতাংশ। প্রতি বছর সমুদ্র পথে ১৫০টিরও বেশি দেশের প্রায় ৫০ হাজারের উপর বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে। United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD এর মতে শুধুমাত্র ২০১৬ সালে ১০২৮৭ মিলিয়ন টন পণ্য সমুদ্র পথে আনা নেওয়া করা হয়েছে।

ঘ. পর্যটন শিল্প: পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের বিপুলসংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ আগামীতে ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার তথ্য মতে, ২০১৮ সালের মধ্যে এ শিল্প হতে ২৯ কোটি ৭০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখবে প্রায় ১০.৫%।

ঙ. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল: বহুমাত্রিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল উপকূলবাসীকে রক্ষা করে আসছে। আবার এই বনের বাস্তুসংস্থানের সাথে এখানকার উপকূলীয় মানুষের জীবিকা জড়িত কিন্তু অপরিকল্পিত সম্পদ আহরণের ফলে এর জীববৈচিত্র প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। উপকূলের নিরাপত্তায় সবুজ বেষ্টনি গড়ে তুলতে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। সমুদ্র অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে ম্যানগ্রোভ বন এবং এর জীববৈচিত্র রক্ষার গুরুত্ব রয়েছে। সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা ৪০ লক্ষের বেশি। কিন্তু এর বেশির ভাগই স্থায়ী জনগোষ্ঠী নয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে যেমন, ঠিক তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতেও সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি দেশের বনজ সম্পদের একক বৃহত্তম উৎস। এই বন কাঠের উপর নির্ভরশীল শিল্পে কাঁচামাল গোন দেয়। **এ বন থেকে নিয়মিত ব্যাপকভাবে আহরণ করা হয় ঘর ছাওয়ার জন্য গোলপাতা, মধু, মোম, মাছ, কাঁকড়া এবং শামুক-ঝিনুক। বৃক্ষপূর্ণ সুন্দরবনের এই ভূমি একই সাথে প্রয়োজনীয় আবাসস্থল, পুষ্টি উৎপাদক, পানি বিশুদ্ধকারক, কার্বন নিরসনকারী, পলি সঞ্চয়কারী, ঝড় প্রতিরোধক সবুজ বেষ্টনী, উপকূল স্থিতিকারী, শক্তি সম্পদের আধার এবং পর্যটন কেন্দ্র।** বাংলাদেশের বন বিভাগ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও উপকূলীয় বনায়ণের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করে উপকূলীয় ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার একর (প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর) এলাকা বনায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর নিকট হস্তান্তর ও বন আইনের ৪ ধারায় সংরক্ষিত ঘোষণা করেছেন। তাছাড়াও ম্যানগ্রোভ বনায়নের পাশাপাশি উপকূলীয় জেলাসমূহে নন-ম্যানগ্রোভ ৮৮৬০ হেক্টর, গোলপাতা ৩১৯০ হেক্টর, নারিকেল ১০ হেক্টর, এরিকা ৪০ হেক্টর, বাঁশ ও বেত ২৮০ হেক্টর, রাস্তার ধারে ৪৮৫০ হেক্টর (রূপান্তরিত) বনায়ন করা হয়েছে। বন বিভাগ ২ লক্ষ হেক্টর (প্রায় ৫ লক্ষ একর) চরাঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে নয়নাভিরাম উপকূলীয় বন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম। উপকূলীয় বনায়নের ফলে, হাজার হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদ এবং বসবাসের জন্য উপযোগী হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে ১১২,০৬৩ একর (প্রায় ৪৫,৩৭০ হেক্টর) জমি ফসল উৎপাদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করা

হয়েছে। আরও প্রায় ৫০ হাজার একর (প্রায় ২০২৪৩০ হেক্টর) বনায়ন কৃত ভুমি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করার অপেক্ষায় আছে। সর্বোপরি, সবুজ বেষ্টনী হিসাবে, উপকূলীয় বন প্রাত্যক্ষভাবে ঘুর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে লক্ষ লক্ষ জীবন এবং সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। **এছাড়াও, উপকূলীয় বনায়ন নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও ভোলা উপকূলীয় জেলায় অর্থনীতির একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।**

৫. সমুদ্র অর্থনীতিতে বাংলাদেশের সুযোগ ও সম্ভাবনা

ক. মৎস সম্পদ আহরর করেই উপকূলীয় এলাকায় দারিদ্র দূরীকরন সম্ভব: আমাদের অধিকৃত সমুদ্র এলাকায় কি পরিমান মৎস সম্পদ আছে তা নিয়ে বর্তমানে সরকারের জরীপ কাজ চলছে। তবে সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী সমুদ্র এলাকায় ২৯৮ প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে (ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস ২১.০৫.২০১৮) এবং এর মজুদের পরিমানও বিণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনার মত। **উল্লেখ্য যে, বঙ্গোপসাগর হতে প্রতি বছর প্রায় ৮ মিলিয়ন (কালের কণ্ঠ ০১.০৬.২০১৭) মেট্রিক টন মাছ ধরা হলেও আমরা মাত্র ০.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরছি। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার মাছ আহরণ বাড়াবে বলে আমরা মনে করি।** তবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৩০ লাখ পরিবার মৎস কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তাদের জীবন-জিবীকা নির্ভর করে মূলত উপকূলীয় এলাকায় মৎস আহরনের উপর, এর বাইরেও প্রায় তিন লাখ মানুষ রয়েছে যারা প্রক্রিয়াজাত ও বপিনন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। সুতরাং সার্বিক হিসাবে প্রায় ১.৫ থেকে ২.০০ কোটি মানুষ উপকূলীয় মৎস ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভ করে তাদের জীবনযাত্রা চালাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে যাতে দরিদ্র মৎসজীবিরা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়ে বরং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়ে।

খ. খনিজ ও লবণ উৎপাদন: দেশে গুরুত্বপূর্ণ যে কয়টি শিল্প রয়েছে, তার মধ্যে লবণ শিল্প অন্যতম। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে উৎপন্ন লবণকে কেন্দ্র করে বৃহৎ লবণশিল্প গড়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে সমুদ্রের লোনা পানি দ্বারা ডিসেম্বর হতে মধ্য মে পর্যন্ত লবণ উৎপাদিত হয়ে আসছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকা যেমন: কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, টেকনাফ ও বাঁশখালীর কিছু অংশ লবণ চাষের জন্য উপযোগী বলে চিহ্নিত। বর্তমানে বিসিকের হিসাবমতে ৭৪ হাজার একর জমিতে চাষিরা লবণ চাষ করে। এ শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে প্রায় ৫৫ হাজার লবণ চাষী। লবণ উৎপাদনের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বড়ঘোনা, পটুয়াখালী উপকূলীয় এলাকায়ও পরীক্ষামূলকভাবে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে লবণ চাষের আওতায় আনার জন্য। ২০০০-২০০১ সাল থেকে পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন শুরু হয়। সনাতন পদ্ধতিতে একর প্রতি লবণের উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭.২৫ মেট্রিক টন এবং নতুন পদ্ধতিতে প্রতি একরে লবণ উৎপাদিত হয় প্রায় ২১ মেট্রিক টন। **এই পদ্ধতিতে সনাতন পদ্ধতির তুলনায় ৩৫% অধিক ও আন্তর্জাতিক মানের লবণ উৎপাদিত হয়, যা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করার সম্ভবনা সৃষ্টি করতে পাওে বলে** মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। **বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতিতে লবণ শিল্পের অবদান প্রায় ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা। বিগত বছর লবণের চাহিদা ছিল প্রায় ১৭ দশমিক ৭৬ লাখ টন। দেশে লবণ উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ১৩ দশমিক ৬৪ লাখ টন।**

আমাদের সাগরও হতে পারে কিছু খনিজ লবন বিশেষ করে ম্যাগনেসিয়াম উৎপাদনের অন্যতম উৎস। সমুদ্র থেকে আহরিত ম্যাগনেসিয়াম লবণ এয়ারক্রাফট নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পটাশিয়াম লবণ সার ও নানা ধরনের রসায়ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। ওষুধ তৈরিতে ব্রোমিন এবং ওয়াল বোর্ড নির্মাণে জিপসাম ব্যবহৃত হয়। **এছাড়াও সমুদ্র থেকে পেতে পারি ১৫ হাজার রাসায়িনক পদার্থ যা দিয়ে বিভিন্ন রোগের ওষুধ তৈরি সম্ভব। আগামী প্রজন্মের ওষুধের যোগান আসবে সমুদ্র থেকেই।** সতেরাং আমার এসকল বিষয় সমুহ নিয়ে গবেষণা কওে দেখতে পারি কোন কোন খাতে আমাদেও সুবিধা রয়েছে এবং আমরা সেসব সামুদ্রিক লবণ উৎপাদনে কাজকরতে পারি।

গ. জাহাজ নির্মাণ ও শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড: **বাংলাদেশ জাহাজ নির্মাণে বিশ্বে ১৩ তম আর শিপ ব্রেকিং এ ৩য়। বিশ্বের ২৪.৮ ভাগ জাহাজের চাহিদা বর্তমানে পূরণ করছে আমাদের দেশ। পৃথিবীর মোট জাহাজ ভাঙার ২৪.৮ শতাংশ বাংলাদেশে সম্পাদিত হয়।** দেশের দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপকূলীয় অঞ্চল এ শিল্পের জন্য পরিবেশ বান্ধবভাবে কাজে লাগাতে পারলে জাতীয় অর্থনীতিতে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

ঘ. পর্যটন শিল্প: সমুদ্র অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করতে সরকার সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন এবং কুয়াকাটার পর্যটন শিল্পকে আরো বিকশিত করা সম্ভব। বাংলাদেশে রয়েছে ১২০ কিলোমিটারের পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈতক- কক্সবাজার। এই সমুদ্র সৈকতকে ঘিরে পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে পারলে গোটা বাংলাদেশই বদলে যেতে পারে। **আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য কক্সবাজার ও প্রবাল দ্বীপ সেন্টর্মাটিনকে আর্কষণীয় করে তুলতে পারলে এ অঞ্চলে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ২৭ লাখ ১৪ হাজার ৫০০টি চাকরি সৃষ্টি হয়েছে, যা সর্বমোট কর্মসংস্থানের ৩.৭ ভাগ। World Travel and Tourism Council -WOTTC'র মতে, এ বছরের শেষে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান দাঁড়াবে ৩৮ লাখ ৯১ হাজার, যা বাংলাদেশের সর্বমোট কর্মসংস্থানের ৪.২%। এর ফলে বাংলাদেশের এ শিল্পে বার্ষিক কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি ২.৯%। পর্যটন শিল্পের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ অবদানের ভিত্তিতে ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অবস্থান ১৪২তম, আমরা এ হার আরও বাড়াতে পারি বিশেষ করে সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারন কওে, কারন বাংলাদেশের সব উপকূলীয় জেলাতেই পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়া সম্ভব।**

ঙ. সমুদ্রে খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা: বাংলাদেশে সাগরবক্ষ থেকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কাজ অত্যন্ত ধীরগতিতে চললেও মিয়ানমারের সাগরবক্ষ থেকে এরই মধ্যে চারটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। উভয় দেশের সাগরবক্ষ একই ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের। আর ভারতের কৃষ্ণা গোধাবেরি বেসিনে ১০০ টিসিএফ গ্যাসের সম্ভাব্য মজুদের কথা জানিয়েছে সেখানে কর্মরত বিদেশি কোম্পানি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি ও এনজিসি। 'মিয়ানমারের সাগরবক্ষের ধারাবাহিকতা হলো বাংলাদেশের কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিনের সাগরভাগ। এই অংশটা একই ভূ-তাত্ত্বিকভাবে গঠিত। **মিয়ানমারে যেহেতু গ্যাস পাওয়া গেছে, আমাদের এখানেও গ্যাস পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।** এর জন্য প্রয়োজন তড়িৎ অনুসন্ধান। আমাদের সমুদ্রের ২৮

টি ব্লকের মধ্যে দুটি ব্লকে বহুজাতিক কোম্পানি কনোকো-ফিলিপস প্রায় ৫ টিসএফ গ্যাস পেয়েছে বলে জানিয়েছে। ভারত মহাসাগরের সমুদ্র মহীসোপানে বিপুল পরিমান গ্যাস পাওয়া গেছে, সাথে মূল্যবান গ্যাস হাইড্রোজ। মিয়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সমুদ্র বেসিনে পাওয়া গেছে আরেক গ্যাস ভাণ্ডার। একই ভূতত্ত্ব গঠনের কারনে বাংলার সমুদ্র বক্ষেও তেমনটি হবে- এটা আমরা আশা করতেই পারি। **এছাড়াও আমাদের সমুদ্রে প্রায় পনের টি মূল্যবান খনিজ যেমন ইলামেনাইট, জিরকোনিয়াম, টাইটেনিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি রয়েছে যার বৈদেশিক মূল্য কোটি কোটি ডলার।**

চ. **সমুদ্র বাণিজ্য ও যোগাযোগ:** বাংলাদেশে নির্মাণ করা সম্ভব গভীর সমুদ্র বন্দর। বাংলাদেশের প্রায় ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি-রফতানি পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ২৬০০ বাণিজ্যিক জাহাজ চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে আনা-নেয়া করে। ২০০৮ সালে বেসরকারি মালিকানায় বাংলাদেশি সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬টি। কিন্তু সমুদ্র পরিবহনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এখন তা ৭০-এ দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে আমদানি-রফতানিতে দেশীয় জাহাজের সংখ্যা বাড়লে এ খাতে বড় ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। **এছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন খাতে ২০০৮ সালে রেজিস্ট্রি করা জাহাজ ছিল চার হাজার। এখন যা নয় হাজারে পৌঁছেছে। পণ্য আমদানি-রফতানিতে বাংলাদেশি জাহাজ যুক্ত হওয়ায় দেশে গড়ে উঠেছে শিপিং এজেন্সি, ফ্রেইট-ফরোয়ার্ডিং এবং ব্যাংক-বীমা খাত। এ খাতে নতুন ধরনের কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।**

ছ. **বিদ্যুৎ উৎপাদনে সম্ভাবনা:** সমুদ্র স্রোত, জোয়ার ভাটাকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে পাওয়া যেতে পারে বিদ্যুৎ শক্তি। এই শক্তির উৎপাদনে পরিবেশ দূষণ হবে না। ভারত প্রায় দুই লক্ষ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, যার প্রায় দশ শতাংশ অথাৎ ২০ হাজার মেগাওয়াট আসে সমুদ্র থেকে। এর বাইরে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় আমরা বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারি। বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মাঝে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৫%-১৫% ভাগ নবায়ন যোগ্য খাতে নিয়ে যাবে।

জ. **ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের গুরুত্ব:** বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২ ভাগ এবং দেশের মোট বনভূমির ৪৪ ভাগ জুড়েই সুন্দরবন। বন থেকে আসা মোট আয়ে সুন্দরবনের অবদান প্রায় ৪১ শতাংশ এবং কাঠ ও জ্বালানী উৎপাদনে অবদান প্রায় ৪৫ শতাংশ। অনেকগুলি শিল্প (যেমনঃ নিউজপ্রিন্ট, দেয়াশলাই, হার্ডবোর্ড, নৌকা, আসবাবপত্র) সুন্দরবন থেকে আহরিত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন অ-কাঠজাত সম্পদ এবং বনায়ণ কমপক্ষে তিন লক্ষ উপকূলবর্তী জনসংখ্যার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উৎপাদনমুখী ভূমিকার পাশাপাশি সুন্দরবন, ঘূর্ণিঝড়প্রবণ বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জনসংখ্যা ও তাদের সম্পদের প্রাকৃতিক নিরাপত্তাবলয় হিসেবে ভূমিকা রাখে। বলেশ্বর, পশুরসহ প্রায় ৪৫০টি ছোট বড় নদ-নদীর প্লাবনভূমিতে গড়ে ওঠা এই বনের ৬০১৭ কি.মি এলাকায় ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৩৭৫ প্রজাতির প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ২১০ প্রজাতির মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১৪ প্রজাতির কাঁকড়া, ৪৩ প্রজাতির ঝিনুক সহ বিপুল প্রাণবৈচিত্রের সাথে বনজীবী জনগণ গড়ে তুলেছে এক বাদানির্ভর ঐতিহাসিকতা। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বরগুণা জেলার ১৭টি উপজেলার প্রায় ৬ লাখ স্থানীয় বাওয়ালী-মৌয়াল-মাঝি-জেলে-চুনরি-মুন্ডা-মাহাতোর জীবনপ্রবাহ সরাসরি সুন্দরবনকে আগলে আছে। এছাড়াও আরও প্রায় ২৫ লাখ মানুষ কোনো না কোনোভাবে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। জরায়ুজ অংকুরোদগম, শ্বাসমূলের উপস্থিতি, খাড়া লম্বা ঠেসমূল, লবনগ্রন্থি, রসালো পাতা, পাতায় পানি সংরক্ষণ কলার উপস্থিতি এরকম নানান হ্যালোফাইটিক বৈশিষ্ট্য ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ সমূহকে লবণাক্ত বাস্তুসংস্থানে বেঁচে থাকার শক্তি তৈরী করেছে। ম্যানগ্রোভ অরণ্য স্থলজ বনের চেয়ে ভিন্নতর কারণ এখানে বনের পুষ্টির প্রাথমিক উৎসস্থল থাকে বনের বাইরে চারধার জুড়ে। ম্যানগ্রোভ বন সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানের অন্যতম খাদ্য উৎস কিন্তু প্রস্তাবিত রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প সুন্দরবনের জন্য হুমকি স্বরুপ। যা এর জটিল খাদ্যশৃংখল ও স্পর্শকাতর বাস্তুসংস্থানকে ধ্বংস করতে পারে। সুন্দরবনে একটি প্রাণের সাথে আরেক প্রাণের এমন গভীর জটিল সম্পর্ক যে, একটির ক্ষতি হলে পুরো বনকেই তা সামাল দিতে হবে। যার করুণ পরিণতি ভবিষ্যতে সরাসরি বাংলাদেশকে এবং বিশ্বকেও টানতে হবে।

৬. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমুদ্র অর্থনীতির সুযোগ ও সম্ভাবনা

ক. **কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন:** বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে প্রতিবছর ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরা পড়ে। এর মধ্যে শূন্য দশমিক ৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা আহরণ করে, বাকি মাছ ধরে নিয়ে যায় মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভারতীয় জেলেরা। বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে মাছের উৎপাদন ছিল ৪১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৩৪ মেট্রিক টন। (আমাদের সময় ১৮.০৭.২০১৮)

এ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত কিছু জরিপ থেকে জানা যায়, নানা প্রজাতির মূল্যবান মাছ ছাড়াও সমুদ্রসীমায় নানা ধরনের প্রবাল, গুল্মজাতীয় প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির চিংড়ি, তিন প্রজাতির লবস্টার, ২০ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ৩০০ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক পাওয়া যায়। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা নির্ধারিত হওয়ার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিধি বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় নতুন বেশ কিছু উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার যেখানে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। **সমুদ্রে (বাংলাদেশ অংশে) কী পরিমাণ মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, নৌ চলাচলসহ অন্যান্য কী ধরনের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ১৯টি মন্ত্রণালয়। আশার কথা হচ্ছে, এরই মধ্যে জরিপ কাজ করতে মালয়েশিয়ার নির্মাণাধীন আধুনিক মানের গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মিন সন্ধানী' নামের অত্যাধুনিক জাহাজকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে। যে জাহাজে আছে সোনার, ফিস ফাইন্ডার, রাডার, ডিপ সি ভিডিও মনিটরিং সিস্টেম, ইকো সাউন্ডারসহ উপরি-তলের টোনা জাতীয় মাছের মজুদ নির্ণয়ে অ্যাকুস্টিক সার্ভের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি। আমরা আশাবাদী, অনুসন্ধান কাজের পর আমাদের এ সমুদ্র সম্পদ থেকে হয়তো ১০ লাখ টন কিংবা তারও বেশি সামুদ্রিক মাছসহ অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করতে পারব।**

খ. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:** সমুদ্র থেকে মাছ ধরে শুধু বিদেশে রফতানি করেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব। **এ ছাড়া মাছ থেকে খাবার, মাছের তেল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ, সস, চিটোসান তৈরি করা সম্ভব, যাতে নতুন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তা বিদেশে রফতানি করেও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।** শুধু সামদ্রিক মাছ ও শৈবাল রফতানী করে বাংলাদেশ বছরে এক বিলিয়ন

ডলারের সম পরিমাণ অর্থ আয় করতে পারে। বিগত সময়ের মাছ উৎপাদনের ধারা বিশ্লেষণ করে আমাদের মাছ উৎপাদনের আগামীর যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে সে অনুযায়ী ২০২০-২১ সালে দেশে মাছ উৎপাদন হবে ৪৫.৫২ লাখ টন এবং সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আগত জনগোষ্ঠীর জন্য যে ৪৫.২৮ লাখ টন মাছের চাহিদা রয়েছে, তাও মেটানো সম্ভব হবে সামুদ্রিক মাছের মাধ্যমে। **প্রতি বছর প্রায় ৫ লাখ টন মাছের (আলোকিত বাংলাদেশ ১৫.০১.২০১৭) যোগান আসে সামুদ্রিক মাছ থেকে, যা কিনা মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১৭ শতাংশ।**

গ. **গভীর সমুদ্র বন্দর: সমুদ্র অর্থনীতিতে নিশ্চিত করতে পারে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বঃ** সমুদ্র অর্থনীতি বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করতে প্রস্তাব দিয়েছে চীন। অবশ্য এরই মধ্যে ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তিও হয়েছে। আগ্রহ রয়েছে জাপানেরও। এছাড়া, হাতে নেওয়া হয়েছে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কাজ। দক্ষিণ চীন সাগরে জাপান ও আমেরিকার সঙ্গে বিরোধ থাকায় চীনের দরকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের নতুন জলপথ। এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী হলো বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগর হলো একবিংশ শতাব্দীর কেন্দ্রীয় মঞ্চ। অন্যদিকে এর তীরেই বসবাস করে বিশ্বের বড় জনসংখ্যার কয়েকটি দেশ: ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। এর ভেতর দিয়েই গেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান জলপথ, এর তীরেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলো। এই সমুদ্র প্রাকৃতিক সম্পদেও সমৃদ্ধ। বর্তমানে বছরে এই জলপথে ৯০ হাজার জলযান (বাণিজ্যিক জাহাজসহ উপকূলীয় এলাকায় চলাচলরত ছোটবড় নৌযান) দিয়ে ৯ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন টন বাণিজ্যিক পণ্য পরিবাহিত হয়। **বিশ্বের ৬৪ শতাংশ তেলবাণিজ্য এই জলপথের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর এবং চট্টগ্রাম বন্দর হলো এই বিশাল অর্থনৈতিক এলাকার প্রবেশমুখ।** এই পথ দিয়ে চীনের ইউনান, জিংজিয়াং, ভারতের নিকটবর্তী প্রদেশগুলোসহ মিয়ানমার, নেপাল, ভুটানের পণ্য বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারবে, তেমনি বাইরের পণ্য এখান দিয়েই ওই সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমারের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর (বিসিআইএম) এবং বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক সহযোগিতা প্রক্রিয়া বিমসটেকের মতো কাঠামোর বাস্তবায়ন করা গেলে এর সুবিধা পুরো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশই পাবে। **চট্টগ্রামে কিংবা মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা গেলে চট্টগ্রাম হতে পারবে এই বিশাল বাণিজ্যপথের প্রবেশমুখ। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে সমুদ্র অর্থনীতি।**

ঘ. **নবায়নযোগ্য জ্বালানী (বিদ্যুৎ) উৎপাদন সহজ করতে পারে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার: ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের ২৭০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। যা বর্তমান সময়ের চাহিদার চেয়ে প্রায় ২০০% বেশি। বাংলাদেশ সরকার এই সময়ের মাঝে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ৫%-১৫% ভাগ নবায়ন যোগ্য খাতের মাঝে নিয়ে যাবে।** বিশ্বের অনেক দেশই সমুদ্রের জোয়ারভাটা বা ঢেউকে ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। আমরা সমুদ্রের ঢেউ ব্যবহার করে আমরা উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ করতে পারি। নবায়নযোগ্য জ্বালানির আরেকটি অন্যতম উৎস বায়ু। **কিন্তু ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চল থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও এই উৎসের ব্যবহার ততটা করতে পারেনি। প্রতি বছর বায়ু থেকে আমরা পাচ্ছি ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।** বিশেষজ্ঞরা ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রামের আনোয়ারা, কুয়াকাটা ও পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় বাতাসের গতি মেপে দেখেছেন। ডেনমার্কের বিশ্বখ্যাত কোম্পানি ভেস্টাস ইতিমধ্যে এর জন্য প্রয়োজনীয় এক বছরের উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শেষ করেছে। এখন পর্যন্ত কক্সবাজার অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে ৬ থেকে ৮ মিটার পাওয়া গেছে, যেটা বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী। ডেনমার্কের বিনিয়োগে কক্সবাজারে চালু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। **এ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৬০ মেগাওয়াট।**

ঙ. **জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাস্তুসংস্থানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্টের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, অম্লতা বাড়ছে, যা প্রবালের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, এই প্রবালপ্রাচীর মাছদের অন্যতম আবাসস্থল। তাই মাছ তাদের আশ্রয় হারাচ্ছে। **অতিরিক্ত মাছ ধরা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্লাস্টিক দূষণের কারণে বিশ্বের সাগর-মহাসাগর এখন হুমকির মুখে। বিশ্বের অন্যান্য জলাশয় থেকে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয়, সাগর থেকে ধরা হয় তার চারগুণ। প্লাস্টিক দূষণের কারনে সাগরের মাছ কমে যাচ্ছে।** সাগরে প্লাস্টিকের পরিমাণ এত বেড়ে গেছে যে, তা পরিষ্কার করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অন্যান্য সমস্যাগুলোর মাঝে রয়েছে বর্ধিত মাত্রায় বরফ গলতে থাকা, বর্ধিত বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়ের বায়ুবেগ ও বৃষ্টিপাতের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতি। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের শতকরা ১৭ ভাগ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যাবে। ফলে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন লোকসংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে ২০ মিলিয়ন বাস্তুচ্যুত হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশকে মানিয়ে নিতে হলে যে অর্থ দরকার তা এ গরিব দেশের পক্ষে বহন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই ব্লু ইকোনমি'-র মাধ্যমে সমুদ্র সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন অনেক বিশেষজ্ঞ।

৭. **সমুদ্র অর্থনীতি বাস্তবায়নে আমাদের জন্য ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ**

ক. **পর্যাপ্ত নীতিমালার ও সঠিক কর্মপরিকল্পনার অভাব:** ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলো সমুদ্র অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে তাদের জাতীয় নীতিমালা পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে যে কারনে অর্থনীতিতে সাগর-কেন্দ্রিক আয় ও প্রবৃদ্ধিতে তারা অনেক অগ্রসর। আমরা বাংলাদেশও তাদেও কাছ থেক অভিজ্ঞতা নিতে পারি এবং আমাদের জন্য গৃহিত একটি সমুদ্র নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারি। এ কাজে বিদেশিদের সাহায্য ও পরামর্শ নেবার সাথে সাথে দেশের বাইরে যেসব বাংলাদেশী এ খাতে গবেষণা ও কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কারতে পারি। পাশাপাশি সমুদ্র অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দেরও প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়ণ, সমুদ্র নির্ভর শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি যেখানে সরকারকে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে দেখা যাচ্ছে না।

খ. **দক্ষ জনশক্তির অভাব:** সমুদ্রের তলদেশের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদ ব্যবহার করতে হলে যে পরিমাণ দক্ষ জনশক্তি দরকার, বর্তমানে বাংলাদেশে সেই পরিমাণ জনশক্তি নেই। **আবার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ থাকলেও প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকার কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সঠিকভাবে গবেষণার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।**

গ. **প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবঃ** ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি), মালয়েশিয়া সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে মালয়েশিয়া থেকে 'আর ভি মিন সন্ধানী' নামে একটি জাহাজ নির্মাণ করে আনা হয়েছে কিন্তু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষকদের মতে, বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশী জলসীমায় খনিজ সম্পদ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের যে ভাণ্ডার রয়েছে তা এখনও অনাবিষ্কৃত এবং দুঃখের বিষয় সম্পদ অনুসন্ধানের পর তা আহরনের জন্য যে প্রযুক্তির প্রয়োজন তা আমাদের নেই।

ঘ. **সম্পদের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাবঃ** বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় কি পরিমাণ সম্পদ ছড়িয়ে আছে তা আজও বাংলাদেশের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তেল-গ্যাসের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান করার জন্য অতীতে বারবার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করার পরও কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের সাড়া পাওয়া যায়নি।

ঙ. **মেরিন রিসোর্স ভিত্তিক পর্যাপ্ত গবেষণা হচ্ছে নাঃ** সমুদ্রের যতটা জানা তার চেয়ে বেশি অজানা বাংলাদেশের কাছে। হয়নি কোন জরিপ, তাই নেই কোন তথ্য। এর পরও সমুদ্রবিজ্ঞানীরা আভাস দিয়ে থাকেন কি সম্পদ আছে এই ব্লু-ইকোনমির আওতায়। তবে সবার আগে প্রয়োজন জরিপ, যা দিবে তথ্য। এরপর নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. **সমুদ্র অর্থনীতি বাস্তবায়নে আমাদের জন্য করনীয়**

ক. **সমুদ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন জাতীয় ও দরিদ্র-বান্ধব নীতিমালাঃ** সরকার ব্লু ইকোনমি বাস্তবায়নের জন্য গত বছর ব্লু ইকোনমি সেল স্থাপন করেছে এবং কিছু জনবল নিয়োগ দিলেও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জাতীয় নীতিমালা প্রনয়নের কাজ গতিশীল করার প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা এবং প্রনয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেশীয় পরিকল্পনাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করে পাশাপাশি বিদেশীর কাছ থেকে অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ গ্রহনের মাধ্যমে এই নীতিমালা প্রনয়ন করা যেতে পারে। আমরা এরকম একটি জাতীয় নীতিমালা প্রনয়নের সময় সরকাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ নিশ্চিত করার আহবান জানাচ্ছি;

১. ব্লু ইকোনমি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অবশ্যই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কমসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

২. সাগর এবং উপকূলে মৎস্য আহণের ক্ষেত্রে বিদেশি ট্রলার নয় বরং দেশীয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. নীতমিালা দরিদ্র মানুষের জন্য বিনিয়োগ বান্ধব হবে অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকতে হবে।

৪. নীতিমালা অবশ্যই নারীদের অংশগ্রহন এবং কর্মসংস্তানের সুযোগ সৃষ্টির নিশ্চিত করবে। সর্বোপরি

৫. ব্লু ইকোনমি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালাটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং পরিবশে সুরক্ষায অবদান রাখতে হবে।

খ. **সমুদ্র অর্থনীতি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনও আমাদের জন্য জরুরিঃ** ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতির স্বপ্ন বাস্তবায়নের ব্লু ইকোনমি সেল গঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। কারন সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহন ছাড়া শুধুমাত্র এই সেলের পক্ষে সমুদ্র অর্থনীতির কৌশল বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি। সরকার টেকসই লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় পরিকল্পনায় সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং সেক্টরসমুহকে অন্তর্ভূক্ত করে কর্মষুচি গ্রহন ও বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। সমুদ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একই কৌশল অবলম্বন করতে হবে এবং এর সাথে সর্ম্পকিত সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং সেক্টটসমূহকে সমন্বিত করে পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে হবে।

দ্বীতিয়তঃ পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় এই সকল প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজ, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবি, মিডিয়া, এনজিও এবং উন্নয়ন কর্মী সকলকেই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং তাদের মতামতনিতে হবে। তৃতীয়তঃ সমুদ্র অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা ও জ্ঞান আহরন কার্যক্রম জোড়দার করতে হবে। কারন অন্যেও উপর (তথাকথিত বিদেশী বিশেষজ্ঞ) ভর করে আমরা এ খাতে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারব না।

গ. **অভিযোজনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারঃ** বঙ্গোপসাগরে জলজ উদ্ভিদ ও মাছ সংরক্ষণে মেরিন অ্যাকুরিয়াম এবং কক্সবাজারে সামুদ্রিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। এ ছাড়া সমুদ্র অর্থনীতির সহায়তা খাতে নবায়নযোগ্য শক্তি, মেরিন বায়ো টেকনোলজি, ইকো টুরিজম, সমুদ্র দূষণ প্রতিরোধ, বনায়নসহ সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও গবেষণার ব্যাপারে সবক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে এবং আমাদের এক্ষেত্রে প্রয়েজনীয় নতুন, কার্যকর এবং লাগসই প্রযুক্তির সন্ধান করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে যদি আমরা সুফল পেতে চাই। বঙ্গোপসাগরের বিশাল মৎস্য সম্পদের এক শতাংশও বাংলাদেশের জেলেরা ধরতে পারছেন না উন্নত ধরনের জাহাজ ও প্রযুক্তির অভাবে। নবায়ন যোগ্য শক্তির বিশাল সম্ভাবনাকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না শুধুমাত্র এর প্রযুক্তির উপর বিদেশ নির্ভরতা থাকার কারনে। সুতরাং সরকারকে এ খাতে কৌশল নির্ধারন, বিনিয়োগ ও নীতি-সহায়তা নিশ্চিত করার দরকার আছে যাতে প্রযুক্তি আমরা নিজেরাই উদ্ভাবন এবং আমাদের কাজে লাগাতে পারি।